North South University Library ★ 1992 ★

ও বুদ্ধিবিকাশে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই কারণেই বলা যায়, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষা—সব স্তরেই আমরা এক ধরনের ভঙ্গুর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করছি। যদি আমরা সব ধারার শিক্ষাব্যবস্থাকে সঠিকভাবে সহায়তা করতে পারি, তাহলে আগামী ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সম্ভব। তবে এটি কখনোই পাঁচ বা দশ বছরে সম্ভব নয়। এজন্য অবকাঠামোগত, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক এবং মানবসম্পদ সব ক্ষেত্রেই সমন্বিত বিনিয়োগ প্রয়োজন।

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ সময়ের শিক্ষকতা ও গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনার। আপনি সেখানে যা দেখেছেন, সেই বাস্তবতার আলোকে যদি সংক্ষেপে বলতেন, আমাদের আর তাদের মৌলিক পার্থক্যটা আসলে কোথায়?

—সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে আমরা এখনো বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি। উন্নত দেশগুলোতে একটি শিশুকে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে শিক্ষাব্যবস্থা বৈচিত্র্যময় হলেও একটি কাঠামোগত ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। সেসব দেশে ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই শিক্ষণ-পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু অ্যাডিশন করা হয়। শিক্ষাক্রম অনেক ক্ষেত্রেই সেমি-স্ট্রকচারড, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যবই থাকলেও একটি দেশের সব শিক্ষার্থী একই বই পড়ে না। বইয়ের মধ্যে ভিন্নতা থাকে। এই ভিন্নতা শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনায় বৈচিত্র্য তৈরি করে। বাংলাদেশেও আমি এই ধরনের বৈচিত্র্য দেখতে চাই। বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বা গণিতের জ্ঞান কেন ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীর চেয়ে কম হবে? আবার ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা কেন নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কম জানবে? আমরা ব্যবস্থা করে রেখেছি যে প্রকৌশল পড়ার জন্য শুধু পদার্থবিজ্ঞান আর গণিতের জ্ঞানই যথেষ্ট। আবার মেডিক্যালের জন্য জীববিজ্ঞান ও রসায়ন। এসব ভুল পদ্ধতি।

টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি ও কিউএস র‍্যাংকিংয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ঈর্ষণীয়। আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কোথায় নিয়ে যেতে চান?

—নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় তার ৩৫ বছরের সফরে বাংলাদেশের সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে গুণগত মানে পেছনে ফেলেছে। আমি সুদীর্ঘ ২০ বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যখন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে ফেরত আসি, সেখানে আমার ১৫-১৬ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে যোগ দিই। এই বিজনেস স্কুলটাকেই সবচেয়ে বেশি সময় দিয়েছি। আজকের যে বিজনেস স্কুল সেখানে আমি তিনবার ডিন ছিলাম, সবচেয়ে লম্বা সময় বিবিএর পরিচালক ছিলাম, দীর্ঘতম সময় এই বিজনেস স্কুলটা চালিয়েছি। সেই বিজনেস স্কুল আজ পৃথিবীর লাখ লাখ বিজনেস স্কুলের মধ্যে সেরা ৬০০টির মধ্যে চলে এসেছে। একজন উপাচার্য হিসেবে বলব, এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা বিশ্বমানের সঙ্গে তুলনা করেই চিন্তা করি। আশা করছি, বিজনেস স্কুল হিসেবে এটি আগামী বছর পৃথিবীর সেরার স্বীকৃতি পাবে। আমাদের প্রাথমিক টার্গেট, নর্থ সাউথকে এশিয়ার টপ-১০০-এ নিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা পরীক্ষার ফলাফল ও জিপিএ-কেন্দ্রিক। এটা শিক্ষার মানের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে?

—আমরা যেভাবে জিপিএ-সিজিপিএ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিবেচনা করি, তা উন্নত দেশে নেই; বরং তারা সফল কি না, তাদের কাজ প্রভাব সৃষ্টি করছে কি না, সমাজে তার অবদান কেমন ইত্যাদি দেখে। আমাদের সব আটকে গেছে গোল্ডেন জিপিএর মধ্যে। কখনোই এটা বলা উচিত না যে কোনো স্কুলের শতভাগ শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল করেছে বলেই ওই স্কুলটা ভালো। এভাবেই আমরা বৈষম্য সৃষ্টি করেছি। এতে ইনস্টিটিউশনাল ইগো তৈরি হচ্ছে। ফলে আমরা খারাপ আখ্যা দিয়ে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে ফেলছি এবং সেই শিক্ষার্থীরাও বঞ্চিত হচ্ছে। মূলত পরিবার, স্কুল, প্রতিষ্ঠান এবং সার্বিকভাবে রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার দর্শনে সমস্যা রয়েছে। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—শিক্ষাক্ষেত্রের দার্শনিক লক্ষ্য নির্ধারণ। আধুনিক বিশ্বে কোথাও এসএসসি, এইচএসসি বা কোনো লেভেলে রেজাল্ট নিয়ে কোনো উৎসব দেখা যায় না। দশম বা দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশের দিন ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের ঘিরে পুরো জাতি একটা উৎসব মেজাজে থাকে। ঠিক সেই দিনটিতে খারাপ রেজাল্ট করা শিক্ষার্থীরা মারাত্মকভাবে ডিমোরালাইজড হয়। ওই দিনটিতেই প্রধানশিক্ষক থেকে শুরু করে অভিভাবকরা মিলে শিক্ষার্থীদের বিশাল এক অংশের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে। এসব আচরণের অবসান দরকার। ফলাফলটা আমরা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে যেন ফেলে না দিই। এটা যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে, রেজাল্টের বই হাতে নিয়ে মন্ত্রীর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—এই সিরেমোনিয়াল পার্টগুলো তুলে দিতে হবে।

প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করলেও অনেকেই চাকরি পাচ্ছেন না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে কর্মবাজারের সংগতি কি নেই?

—বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের সর্বশেষ ডিগ্রির পরে তাকে জব সিকিং এলিমেন্ট হিসেবে দেখা হয়। যেন সে শিক্ষা অর্জন করেছেই চাকরির জন্য। বাংলাদেশে এখন যে পরিমাণ গ্র্যাজুয়েট প্রতিবছর বের হচ্ছে, সে পরিমাণ চাকরি বাংলাদেশে কোনো দিনই আগামী ৩০ থেকে ৪০ বছরে প্রস্তুত হবে না। আমাদের শিল্পক্ষেত্র বা অর্থনীতি এত ফুলে-ফেঁপে ওঠেনি। শিক্ষা কার্যক্রমে দক্ষতার জ্ঞান ও উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার মনোভাব যোগ করতে হবে। যেন বাচ্চারা বেরিয়ে নিজে কিছু করতে পারে, তার দক্ষতা যা আছে তা দিয়েই সে এগিয়ে যাবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে ভাষার জন্য বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন করতে হবে। এটা যুগপৎ সিদ্ধান্ত। আমি বলব, কারো ভাষাজ্ঞান যখন বেশি থাকে তখন আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে তার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তা ছাড়া তাদের ভাবতে হবে বা সুযোগ দিতে হবে যে তারা নিজেরা চাকরিপ্রার্থী নয়, চাকরিদাতা হয়ে উঠবে।

আমরা যেভাবে জিপিএ-সিজিপিএ দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিবেচনা করি, তা উন্নত দেশে নেই; বরং তারা সফল কি না, তাদের কাজ প্রভাব সৃষ্টি করছে কি না, সমাজে তার অবদান কেমন ইত্যাদি দেখে। আমাদের সব আটকে গেছে গোল্ডেন জিপিএর মধ্যে। কখনোই এটা বলা উচিত না যে কোনো স্কুলের শতভাগ শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল করেছে বলেই ওই স্কুলটা ভালো

'ডিগ্রি উৎপাদন' হচ্ছে; কিন্তু দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?

—আমাদের দেশে সব বিশ্ববিদ্যালয় এক মানের না।